بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ জুন, ২০২৪ মোতাবেক ০৭ এহসান, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ যে অভিযানের উল্লেখ করব সেটিকে হযরত মুনযের বিন আমর-এর অভিযান অথবা বি'রে মঊনার অভিযান বলা হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও ৪ হিজরী সনে ঘটেছে। কারো কারো মতে এটি রাজী'র অভিযানের পূর্বে এবং কারো কারো মতে রাজী'র পরে ঘটেছে। এই দুর্ঘটনাও রাজী'র ন্যায় শত্রুদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং নির্দয়তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এই অভিযানকে বি'রে মঊনার অভিযান বলা হয়। বি'রে মঊনা মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে বনু সুলায়েম গোত্রের অঞ্চলে একটি কূপ ছিল আর এই নামেরই অঞ্চল ছিল সেটি। এ কারণেই এর নাম বি'রে মঊনার অভিযান হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই অভিযানের দলনেতা ছিলেন হযরত মুনযের বিন আমর। এ কারণে এটিকে হযরত মুনযের বিন আমর-এর অভিযানও বলা হয়। একইভাবে এটিকে সারিয়াতুল কুরা নামেও অভিহিত করা হয়। বি'রে মঊনার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী যুবক ছিলেন। পবিত্র কুরআনের কারী হওয়ার কারণে মানুষ তাদেরকে কুরা উপাধিতে স্মরণ করত।

এই অভিযানের পটভূমি সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন যে, সুলায়েম ও গাতফান গোত্রগুলো মধ্য আরবের নাজাদ মালভূমিতে বসবাস করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। আর ধীরে ধীরে এসব দুষ্ট গোত্রগুলোর দুষ্টামি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর পুরো নাজাদ মালভূমি ইসলামের প্রতি শত্রুতার বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠছিল। অতএব সেই দিনগুলোতে, লেখা আছে যে, যার উল্লেখ আমরা এখানে করছি, এক ব্যক্তি আবু বারাআ আমেরী, যে মধ্য আরবের বনু আমর গোত্রের একজন নেতা ছিল, মহানবী (সা.)-এর সমীপে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি (সা.) একান্ত নম্রতা ও স্নেহের সাথে তার কাছে ইসলামের তবলীগ করেন। সে-ও বাহ্যত খুবই আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নি। তথাপি সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এই নিবেদন করে যে, আপনি আমার সাথে আপনার কতিপয় সাহাবীকে নাজাদে প্রেরণ করুন যারা সেখানে গিয়ে নাজাদবাসীদের মাঝে ইসলামের তবলীগ করবে। আর আমি আশা করি নাজাদের অধিবাসীরা আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে না। তিনি (সা.) বলেন, নাজাদবাসীদের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। আবু বারাআ বলে, আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না, আপনি যাদের প্রেরণ করবেন আমি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবু বারাআ যেহেতু একটি গোত্রের নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল (তাই) তিনি (সা.) তার প্রদত্ত নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন আর সাহাবীদের একটি দল নাজাদে প্রেরণ করেন। [এটি হলো ইতিহাসের রেওয়ায়েত।]

বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র প্রমুখ, যারা প্রসিদ্ধ গোত্র বনু সুলায়েম-এর শাখা ছিল, তাদের কতিপয় লোক মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর ইসলাম গ্রহণের কথা বলে অনুরোধ করে যে, আমাদের জাতির মধ্য থেকে যারা

ইসলামের শত্রু রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে কিছু লোককে প্রেরণ করা হোক। এখানে এই ব্যাখ্যা নেই যে, এটি কোন্ ধরনের সাহায্য ছিল, তবলীগি (সাহায্য) নাকি সামরিক (সাহায্য)। যাহোক, এর ফলে মহানবী (সা.) এই দলটিকে প্রেরণ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বি'রে মঊনার বিস্তারিত বর্ণনায় বুখারীর বিভিন্ন রেওয়ায়েতেও কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার ফলে বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু যাহোক এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ উপলক্ষ্যে রি'ল ও যাকওয়ান ইত্যাদি গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর কাছে এসেছিল আর তারা এই অনুরোধ করেছিল যে, কতিপয় সাহাবীকে যেন তাদের সাথে প্রেরণ করা হয়। এই উভয় রেওয়ায়েতের সাদৃশ্যবিধানের একটি উপায় এটি হতে পারে যে, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকদের সাথে আমের গোত্রের নেতা আবু বারাআ আমেরী-ও এসেছিল এবং সে তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলেছিল। অতএব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, আমি নাজাদবাসীদের বিষয়ে আশ্বস্ত নই এবং তার এই উত্তর দেয়া যে, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার সাহাবীদের কোনো ক্ষতি হবে না– এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আবু বারাআ-র সাথে রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকেরাও এসেছিল, যাদের কারণে মহানবী (সা.) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। যাহোক মহানবী (সা.) ৪র্থ হিজরী সনের সফর মাসে মুনযের বিন আমর আনসারী-র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। এদের অধিকাংশ আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০। প্রায় সবাই ছিল কারী এবং কুরআনের পাঠক।

এ সম্পর্কে একজন লেখক লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিনিয়ত এই আশাতেই থাকতেন যে, আল্লাহ্‌র ধর্ম যেন সারা পৃথিবীতে বিজয়ী হয়। সবাই যেন ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় চলে আসে এবং এক খোদার ইবাদত করা আরম্ভ করে, যাতে তারা ইহ ও পরকালে সফলতা লাভ করে। এ কারণেই তিনি ধর্মের প্রতি আহ্বান ও তবলীগের দায়িত্বকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন আর এর জন্য সমস্ত উপকরণকে কাজে লাগানো এবং বড় থেকে বড় কুরবানী করতেও পিছপা হতেন না। এ কারণেই নাজাদের বর্বর ও গ্রাম্য অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করেন আর আবু বারাআ-র নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে সাহাবীদের একটি বড় দল তাদের কাছে প্রেরণ করেন। এত বড় পদক্ষেপ তিনি (সা.) কেবল ধর্মের প্রতি আহ্বান ও তবলীগের দায়িত্ব পালন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পবিত্র কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য করেন।

যাহোক দলের প্রধান হযরত মুনযের বিন আমর বনু সুলায়েম গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক মুত্তালেব সুলামি-র সাথে বের হন। যখন তিনি বি'রে মঊনায় পৌঁছেন তখন তাঁবু টানিয়ে নেন। আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী-র তত্ত্বাবধানে নিজেদের বাহনের পশুগুলোকে চারণের জন্য ছেড়ে দেন। তার সাথে হারেস বিন সিম্মাহ্‌ও ছিলেন। ইবনে হিশাম হারেসের স্থলে মুনযের বিন মুহাম্মদ-এর নাম লিখেছেন। এই অভিযানের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর একটি পত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যা তিনি আমের বিন তোফায়েল-এর নামে লিখেছিলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের এই দলের কাছে আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলেন। সে আবু বারাআ আমের বিন মালেকের ভাতিজা এবং বনু আমের গোত্রের নেতাদের মাঝে একজন অহংকারী

ও দাম্ভিক নেতা ছিল। তার বিষয় ছিল এই যে, এই ব্যক্তি মনে মনে মহানবী (সা.)-এর আহ্বানের সত্যতা ও সততার স্বীকারোক্তি দানকারী ছিল আর এই বাস্তবতা খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল যে, শীঘ্রই মহানবী (সা.) পুরো আরব উপদ্বীপে বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভ করবেন। কিন্তু এরই মাঝে সে নিজের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার মন মস্তিষ্কে এই শয়তানী চিন্তা মাথাচাড়া দিতে থাকে যে, আমি নিজেই মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে আগে থেকেই কোনো চুক্তি করে নেই। অতএব সে তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি আপনাকে পূর্ণ অধিকার দিচ্ছি যে, বেদুইনদের ওপর আপনার আর শহরের অধিবাসীদের ওপর আমার কর্তৃত্ব হবে বা আপনার পর আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হব অথবা আমি গাতফানের এক হাজার লাল ও সোনালি ঘোড়া এবং এক হাজার উটের বাহিনী নিয়ে আপনার সাথে যুদ্ধ করব। অর্থাৎ সে তিনটি শর্ত উপস্থাপন করে। মহানবী (সা.) আমের বিন তোফায়েল-এর এই অজ্ঞতাপ্রসূত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থাৎ তার কোনো কথা মানেন নি। সে বিফল হয়ে ফিরে যায়।

বি'রে মঊনার সেনাভিযানের সময় মহানবী (সা.) তাকে ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন। অতএব, তিনি (সা.) বিশেষভাবে তার নামে সাহাবীদের হাতে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেনাপতি হযরত মুনযের বিন আমর (রা.) হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর পত্রটি দিয়ে বনু আমের গোত্রের নেতা আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করেন।

হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-র এই পত্র নিয়ে যাওয়ায় বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) আরও দু'জন সঙ্গীকে নিজের সাথে নিয়ে যান। তাদের মাঝে একজন সাহাবীর একটি পা পঙ্গু ছিল, তার নাম ছিল কা'ব বিন যায়েদ (রা.)। যদিও অপর সঙ্গী সম্পর্কে অধিকাংশ জীবনীকার নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তথাপি বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল্ বারী'তে রাজী'র যুদ্ধ অধ্যায়ের অধীনে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনার সময় অপর সঙ্গীর নাম মুনযের বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেছে। যাহোক, এই তিনজন যাত্রা করেন। হযরত হারাম (রা.) তার দু'জন সঙ্গীকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তোমরা আমার ধারে-কাছেই থেকো, আমি তার কাছে যাচ্ছি। সে যদি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে ঠিক আছে। আর যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে তোমরা দু'জন তোমাদের (অন্য) সঙ্গীদের কাছে ফিরে যেও। এরপর তিনি নির্ভয়ে আল্লাহ্‌র শত্রু আমের বিন তোফায়েলের নিকট যান। (তখন) সে বনু আমের গোত্রের কতিপয় সদস্যের সাথে বসে ছিল। হযরত হারাম (রা.) তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা কি আমাকে এ বিষয়ে নিরাপত্তা প্রদান করবে যে, আমি তোমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পত্র পৌঁছে দিব। তারা বলে, ঠিক আছে, আমরা আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করছি। হযরত হারাম (রা.) তাদের সাথে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। মূসা বিন উকবার রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হারাম (রা.) তাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর পত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেন। তাবারীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে, হযরত হারাম (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন, হে বি'রে মঊনা বাসীগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো। হযরত হারাম (রা.)-এর পবিত্র আলোচনা চলমান অবস্থায়-ই সেখানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ নোংরামির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তারা তাদের একজনকে ইঙ্গিত করলে সে তৎক্ষণাৎ হযরত

হারাম (রা.)-র পেছনে গিয়ে তার ওপর বর্শা দ্বারা আক্রমণ করে যা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হারাম (রা.) পত্র নিয়ে আমের বিন তোফায়েলের নিকট গেলে সেই অত্যাচারী পত্রটি দেখতেও চায় নি বরং তার ওপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে দেয়। যাহোক, হযরত হারাম (রা.)-র ফিরতে বিলম্ব হলে মুসলমানরা তাকে খুঁজতে থাকেন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর তারা সেই দলের মুখোমুখী হয় যারা আক্রমণ করার জন্য আসছিল। তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। শত্রুরা সংখ্যায়ও বেশি ছিল। (রীতিমতো) যুদ্ধ হয় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের শহীদ করা হয়।

এই সেনাভিযানে হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-র শাহাদতের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তার এই সৌভাগ্যও হয়েছিল যে, (তিনি) মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে মদীনায় হিজরতে যোগদান করেছিলেন। তিনিও বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। বি'রে মঊনাতে যখন তাদেরকে হত্যা করা হয় আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.)-কে আটক করা হয় তখন আমের বিন তোফায়েল একটি মরদেহের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করে, এটা কে? আমর বিন উমাইয়্যা (রা.) উত্তরে বলেন; ইনি আমর বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। আমের বিন তোফায়েল বলে, আমি আমের বিন ফুহায়রাহ্কে দেখি যে, নিহত হবার পর তাকে আকাশের পানে তুলে নেওয়া হয়। (সে মুসলমান ছিল না তবুও এই দৃশ্য দেখেছিল।) এমনকি আমি এখনো দেখছি যে, তাঁর ও ভূপৃষ্ঠের মাঝে আকাশের অবস্থান। এরপর তাকে মাটিতে নামানো হয়। মহানবী (সা.) তাঁর (শাহাদতের) সংবাদ পান এবং তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমাদের সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন আর তিনি তার প্রভুর কাছে দোয়া করেছেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।' অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। এটি সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-কে কে শহীদ করেছে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আমের বিন তোফায়েল শহীদ করেছে। পক্ষান্তরে অন্য একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, তাকে জব্বার বিন সালামাহ্ শহীদ করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-র শাহাদতের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন,

ইসলাম তরবারির জোরে বিজয় লাভ করে নি বরং ইসলাম সেই মহান শিক্ষার মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছে যা হৃদয়ে বসত করতো আর চরিত্রে এক উন্নত মানের পরিবর্তন সাধন করতো। একজন সাহাবী বলেন, আমার মুসলমান হবার কারণ শুধু এটি ছিল যে, আমি সেই গোত্রে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেছিলাম যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সত্তরজন কারীকে শহীদ করেছিল। তারা যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন কতিপয় মুসলমান উঁচু টিলায় আরোহণ করেছিলেন আর বাকিরা তাদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলেন। যেহেতু শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল আর মুসলমান খুবই স্বল্প সংখ্যক ছিলেন, তা-ও আবার নিরস্ত্র ও অসহায়; তাই তারা একে একে সকল মুসলমানকে শহীদ করে। অবশেষে শুধু একজন সাহাবী বেঁচে ছিলেন যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তার নাম ছিল আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। অনেকে মিলে তাকে ধরে ফেলে এবং একজন ব্যক্তি সজোরে

তার বক্ষে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। বর্শাবিদ্ধ হতেই তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বাক্য নির্গত হয়, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। বর্ণনাকারী লিখছেন, (যিনি তখনও মুসলমান হন নি,) আমি তার মুখে এ বাক্য শুনে খুবই অবাক হই আর আমি বলি, এই ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের থেকে দূরে, এত বড় বিপদে জর্জরিত, উপরন্তু তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু সে মৃত্যুর প্রাক্কালে কিছু বলে থাকলে তা শুধু এতটুকু যে, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। এই লোক পাগল নয়তো? অতএব (তিনি) বলেন, আমি আরও কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি, আর কেনইবা তার মুখ থেকে এই বাক্য নির্গত হলো? তারা বলে, তুমি জানো না, এই মুসলমানরা আসলেই পাগল। এরা যখন স্বীয় প্রভুর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে তখন মনে করে যে, তাদের প্রভু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। সে বলে, আমার হৃদয়ে একথার এতো গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমি তাদের কেন্দ্রে গিয়ে দেখব এবং স্বয়ং তাদের ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করব। এরপর তিনি বলেন, আমি (এ উদ্দেশ্যে) মদিনায় যাই ও তাদের (ধর্মীয়) শিক্ষা শুনে মুসলমান হয়ে যাই। সাহাবীরা এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একজন ব্যক্তির বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয় আর সে মাতৃভূমি থেকে অনেক ক্রোশ দূরে, তার কোনো আত্মীয়-স্বজনও তার কাছে নেই অথচ তার মুখ থেকে (এই বাক্য) নির্গত হয় যে, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে এর এতো গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি যখন এ ঘটনা বর্ণনা করতেন আর ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা' শব্দাবলি পর্যন্ত পৌঁছতেন, তখন এ ঘটনার বিভিষিকায় হঠাৎ তার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করতো এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। তিনি (রা.) বলেন, তাই ইসলাম স্বীয় গুণাবলীর কল্যাণে প্রসার লাভ করেছে, বাহুবলে নয়।

হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)-এর শাহাদতের সময় তার মুখ থেকে যে বাক্য বের হয়েছিল এর মাঝে ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা এবং ফুযতু ওয়াল্লাহ্- দুটি বাক্যই পাওয়া যায়। দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আর এই শব্দাবলি অন্য সাহাবীদের মুখ থেকেও বের হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, সাহাবীরা যুদ্ধে এমনভাবে যেতেন যেন তাদের কাছে যুদ্ধে শহীদ হওয়া পরম প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। আর যুদ্ধে যদি কোনো আঘাত পেতেন তবে তারা সেটিকে দুঃখ মনে করতেন না বরং সুখ জ্ঞান করতেন। ইতিহাসে সাহাবীদের এমন ঘটনা বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তারা খোদার পথে মৃত্যু বরণ করাকেই নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ, সেই হাফেযগণ, যাদেরকে মহানবী (সা.) মধ্য-আরবের একটি গোত্রের নিকট তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হারাম বিন মিলহান ইসলামের বার্তা নিয়ে আমের গোত্রের প্রধান আমের বিন তোফায়েল-এর নিকট যান এবং অন্যান্য সাহাবীরা পেছনে অবস্থান করেন। প্রথমে তো আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীসাথিরা কপটতা দেখিয়ে তাকে স্বাগতম জানায়, কিন্তু তিনি যখন নিশ্চিন্তে বসে পড়েন আর তবলীগ করতে থাকেন তখন তাদের মাঝে গুটিকতক দুষ্ট ব্যক্তি একজন পাপাচারীকে ইঙ্গিত দেয় এবং সে ইঙ্গিত পেয়েই হারাম বিন মিলহান (রা.)-এর ওপর পেছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত হানলে তিনি লুটিয়ে পড়েন। লুটিয়ে পড়ার সময় তার মুখ দিয়ে অবলীলায় উচ্চারিত হয়, আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ কা'বার প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আমি মুক্তি পেয়ে গেছি। অতঃপর

সেই নৈরাজ্যবাদীরা অন্যান্য সাহাবীদের ঘেরাও করে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রা– যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন, তার সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, বরং তার হন্তারক যিনি নিজেই পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন; তিনি নিজের মুসলমান হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করি তখন অবলীলায় তার মুখ থেকে এ শব্দ বের হয় যে, ফুযতু ওয়াল্লাহ্। অর্থাৎ খোদার কসম! আমি তো আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এ ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, মৃত্যু সাহাবীদের জন্য কোনো দুঃখ ছিল না, বরং আনন্দের কারণ হতো।

যিনি হযরত আমের বিন ফুহায়রাকে (রা.) শহীদ করেন, অর্থাৎ জাব্বার বিন সালামা, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যে বিষয়টি আমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো, আমি বি'রে মঊনা-র দিন আমের বিন ফুহায়রাকে (রা.) দুই কাঁধের মধ্যস্থল লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করি আর আমি বর্শার ফলা তার বুক ভেদ করে যেতে দেখি। সে মুহূর্তেই আমি তাকে একথা বলতে শুনি যে, ফুযতু ওয়াল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আমি সফলতা লাভ করেছি। এই শব্দাবলি আমার কান ভেদ করে হৃদয়ে দাগ কাটে। আমি একথা ভেবে চিন্তায় পড়ে যাই যে, এই শব্দাবলির অর্থ কী হবে; সে কী সফলতা লাভ করল? আমি তো তাকে হত্যা করেছি! আমি একথা ভাবতে ভাবতেই একজন মুসলমান ব্যক্তি যাহ্‌হাক বিন সুফিয়ান কিলাবী-র নিকট যাই। তাকে সমস্ত ঘটনা শুনাই এবং এই শব্দাবলির অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এ সফলতার অর্থ হলো জান্নাত লাভ। এটি শুনে আমি বলি, খোদার কসম, সত্যিই সে সফলতা লাভ করেছে। একইসাথে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

এই বি'রে মঊনার অভিযান সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

এসব লোক যখন সেই স্থানে পৌঁছায় যা একটি কূপের কারণে বি'রে মঊনা নামে বিখ্যাত, তখন তাদের মাঝে এক ব্যক্তি হারাম বিন মিলহান, যিনি কি-না আনাস বিন মালিক-এর মামা ছিলেন, মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আমের গোত্রের প্রধান এবং আবু বারাআ আমরী'র ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান এবং বাকি সাহাবীরা অপেক্ষমান থাকেন। হারাম বিন মিলহান যখন মহানবী (সা.) এর দূত হিসাবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছেন, তখন প্রথমে সে কপটতা প্রদর্শনপূর্বক স্বাগত জানায়, কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ হারাম বিন মিলহান শান্ত হয়ে বসেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের মাঝে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কাউকে ইঙ্গিত দিয়ে সেই নিরপরাধ দূতকে পেছন থেকে বর্শার আক্রমণ দ্বারা সেখানেই হত্যা করে। তখন হারাম বিন মিলহানের মুখে এই শব্দাবলি ছিল- আল্লাহু আকবার, ফুযতু ও রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান! অর্থাৎ কা'বার প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি। আমের বিন তোফায়েল কেবল মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধিকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এরপর নিজ গোত্র বনু আমেরকে উস্কানি দেয় যেন তারা মুসলমানদের অবশিষ্ট দলের ওপর আক্রমণ করে; কিন্তু তারা তার কথা না মেনে বলে, আমরা আবু বারাআ'র নিরাপত্তার বর্তমানে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব না। এরপর আমের সুলাইম গোত্রের বনু রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া প্রভৃতিকে (বুখারীর বর্ণনা অনুসারে এরা ছিল তারা যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিল) সাথে নিয়ে মুসলমানদের এই ছোটো এবং অসহায় দলের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা যখন

এসব বন্য জন্তুকে নিজেদের দিকে আসতে দেখে তখন তারা বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমরা তো কেবল মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে একটি দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আর আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য আসি নি, কিন্তু তারা কোনো কথাই শোনে নি এবং সবাইকে তরবারি দ্বারা হত্যা করে। অত্যাচারীদের আচরণ সর্বদা এরূপ হয়ে থাকে।

বি'রে মঊনার শহীদদের সম্পর্কে লেখা আছে, যুদ্ধবিশারদগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, এই অভিযানে হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং কাব বিন যায়েদ ব্যতীত অন্য সকল সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল। হযরত কাব বিন যায়েদ বি'রে মঊনার দিন আহত হয়েছিলেন এবং খন্দকের দিন মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা, মুয়াবিয়ার যুগে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই অভিযানে অংশ নেওয়া সকল সাহাবীদের নাম জীবনী ও ইতিহাসের গ্রন্থে উল্লেখ নেই। তাসত্ত্বেও শহীদ হওয়া প্রায় উনত্রিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। যখন বই আকারে ছাপানো হবে তখন সেখানে লেখা হবে, এখন আমি নাম উল্লেখ করছি না। উনত্রিশটি নামের দীর্ঘ তালিকা এটি।

যাহোক জীবিত বেঁচে যাওয়া সাহাবীদের সম্পর্কে লেখা আছে যে,

এই অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীদের মধ্য থেকে দুইজন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ, কিছু জীবনীকারের মতে মুনযের-এর পরিবর্তে হারেস বিন সিম্মাহ তখন উট চড়ানোর জন্য নিজ দল থেকে পৃথক হয়ে একদিকে গিয়েছিলেন। তারা দূর থেকে নিজেদের ছাউনির দিকে তাকিয়ে দেখেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। তারা মরুভূমির এই লক্ষণ খুব ভালোভাবে জানতেন। তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যুদ্ধ হয়েছে। ফিরে আসার পর নিষ্ঠুর মুশরিকদের জঘন্য রক্তাক্ত কর্মকাণ্ড তাদের চোখের সামনে ছিল। দূর থেকে এই অবস্থা দেখে তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মাঝে পরামর্শ করেন যে, আমাদের এখন কী করা উচিত। একজন বলেন, আমাদের এখনই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। আর মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেয়া উচিত। কিন্তু অন্যজন এই মত গ্রহণ করেন নি আর বলেন, আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাব না যেখানে আমাদের আমীর মুনযের বিন আমর শহীদ হয়েছেন। অতএব, তারা সামনে অগ্রসর হন আর সেখানে গিয়ে লড়াই করে শহীদ হন। এটি সীরাত খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকের উদ্ধৃতি।

হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরি ছাড়াও আরও এক ব্যক্তি বেঁচে যান যিনি পঙ্গু ছিলেন। সেই সাহাবীর নাম ছিল কা'ব বিন যায়েদ (রা.)। কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় কাফেররা তার ওপরও আক্রমণ করেছিল। তিনি হযরত হারাম বিন মিলহানের (রা.) সাথে ছিলেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং কাফেররা তাকে মৃত মনে করে ছেড়ে দেয়, অথচ গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে জীবনের কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। তাকে শহীদদের লাশের মাঝ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, এরপর তিনি জীবিত ছিলেন আর পরিশেষে খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত আমর বিন উমাইয়্যার গ্রেফতার হওয়ার বিষয়ে লেখা হয়েছে যে, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা গ্রেফতার হন এবং বিরোধীদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে হযরত আমর (রা.) বলেন, আমি বনু মুযের গোত্রের সদস্য। এতে আমের বিন তোফায়েল আমরকে পাকড়াও করে এবং তার কপালের চুল কেটে দেয়। এরপর তাকে নিজের মায়ের পক্ষ থেকে স্বাধীন করে দেয় যে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার মানত করেছিল। আরবরা যখন কাউকে বন্দি করতো এবং পরে তাকে স্বাধীন করে দিত এবং তার সাথে উত্তম আচরণের সংকল্প

করতো, তখন তার কপালের চুল কেটে দিত। এরপর আমর বিন উমাইয়্যা সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে একটি ছায়া বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছে বসে পড়েন। সে সময়েই সেখানে দু'জন ব্যক্তি আসে এবং হযরত আমর (রা.)-এর পাশে এসে বসে পড়ে। আমর এই দুইজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা বললো, আমরা বনু আমের গোত্রের সদস্য। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তারা নিজেদেরকে বনু সুলায়েম গোত্রের বলেছিলেন। এই উভয়ের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চুক্তি ছিল, তদনুযায়ী তিনি (সা.) তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আমর বিন উমাইয়্যা এই চুক্তি সম্পর্কে জানতেন না। আমর তাদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমর তাদের দু'জনকে হত্যা করেন। তার মাথায় তখন শুধু চিন্তা ছিল এর মাধ্যমে তিনি বনু আমের থেকে সাহাবীদের প্রতিশোধ নিয়েছেন। এরপর যখন আমর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন এবং তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন আর এই দু'জনের হত্যার সংবাদ দেন; তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি এমন দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছো যাদের রক্তপণ আমাকে দিতে হবে। তিনি (সা.) তাদের রক্তপণ পরিশোধ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বলেন যে, এটি আবু বারাআ'র কারসাজি। আমি এ কারণেই সাহাবীদেরকে তার সাথে প্রেরণ করাটা অপছন্দ করছিলাম। আর আমার আশঙ্কা ছিল কোথাও এই গোত্রগুলো সাহাবীদের ক্ষতি না করে বসে।

যখন আবু বারাআ জানতে পারে যে, তার ভ্রাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফায়েল তার আশ্রয় ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ভঙ্গ করেছে, তখন সে ভীষণ কষ্ট পায়। এর ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের যে পরিণাম হয়েছে সেজন্য সে মর্মাহত হয়। আবু বারাআ-র পুত্র রাবিয়া, যে তার চাচাতো ভাই ছিল, আমের বিন তোফায়েলের ওপর আক্রমণ করে। রাবিয়া আমেরকে বর্শা নিক্ষেপ করে যা তার উরুতে আঘাত করে আর সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমের চিৎকার করে বলে, আমি যদি নিহত হই তাহলে আমার মৃত্যুর দায়ভার আবু বারাআ'র ওপর হবে। আর যদি আমি বেঁচে যাই তাহলে আমি আমার বিষয়টি নিজেই নিষ্পত্তি করব। যদিও আমের বিন তোফায়েল এই আক্রমণের পর জীবিত ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বদদোয়ার কারণে সে প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করে। তবে আবু বারাআও এতে সম্পৃক্ত ছিল। তার শুরুতে এসেই তাদের থামানো উচিত ছিল। আবু বারাআ অর্থাৎ আমের বিন মালেকের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, তার ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু আলেম তাকে সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেভাবে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বারাআ আমের বিন মালেক বনু বকর ও বনু জাফর গোত্রের পঁচিশজন ব্যক্তির সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) আমের বিন মালেক এবং যাহ্হাক বিন সুফিয়ান কিলাবিকে বনু বকর এবং বনু জাফরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এ রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে অন্যান্য বক্তব্য অনুযায়ী আবু বারাআ মুসলমান হয় নি। যাহোক এ দু'ধরনের বক্তব্যই পাওয়া যায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে বলেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে রাজী' এবং বি'রে মঊনার ঘটনার সংবাদ প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছে; যার ফলে তিনি (সা.) গভীরভাবে শোকাহত হন। এমনকি রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, এর পূর্বেও কখনো তিনি এরূপ কষ্ট পান নি আর পরবর্তিতেও কখনো এরূপ ব্যথিত হন নি। বাস্তবিক অর্থে প্রায় ৮০জন সাহাবীর এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে হঠাৎ শহীদ হয়ে যাওয়া,

আর সাহাবীও তারা যাদের অধিকাংশ কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং নিঃস্বার্থ দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিক ছিলেন; আরবের বর্বরেচিত রীতি-নীতিকে দৃষ্টিপটে রাখলেও এটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। আর স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জন্য এ সংবাদটি আশিজন পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির নামান্তর ছিল, বরং এর চেয়েও অধিক, কেননা জাগতিক কোনো ব্যক্তির কাছে জাগতিক সম্পর্ক যেভাবে প্রিয় হয়, এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তির জন্য আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তার চেয়েও অধিক প্রিয়তর হয়ে থাকে। সুতরাং মহানবী (সা.) এ ঘটনাগুলোর কারণে শোকাহত হন, কিন্তু ইসলামে যেহেতু সর্বাবস্থায় ধৈর্যের নির্দেশ রয়েছে, তাই তিনি এ সংবাদ শুনে إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পাঠ করেন আর এরপর বলেন, এটি আবু বারাআর কাজের পরিণাম, নতুবা আমি তো তাদেরকে পাঠাতে চাচ্ছিলাম না এবং নাজাদবাসীর বিষয়ে আশঙ্কা করছিলাম- একথা বলে তিনি নীরব হয়ে যান।

বি'রে মঊনা এবং রাজী'র ঘটনার মাধ্যমে আরবের গোত্রগুলোর হৃদয়ে বিরাজমান চরম মাত্রায় বিদ্বেষ ও শত্রুতার ধারণা পাওয়া যায় যা তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পোষণ করত। এমনকি ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকেও তারা বিরত ছিল না। মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সতর্ক ও সজাগ থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো নিজেদের মুমিনসুলভ সুধারণা পোষণের কারণে প্রতারণার শিকার হতো। কুরআনের হাফেয, নামাযে অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, মসজিদের এক কোণায় বসে আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন, অধিকন্তু দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ লোকদেরকে এ অত্যাচারীরা ধর্ম শেখার কথা বলে নিজেদের দেশে আহ্বান করে, আর এরপর তারা যখন অতিথিরূপে তাদের দেশে পৌঁছায় তখন তাদেরকে চরম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এ ঘটনাবলীর কারণে মহানবী (সা.) যতই শোকাহত হন না কেন সেটা কমই ছিল, কিন্তু তিনি সে সময় রাজী এবং বি'রে মঊনার হন্তারকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন নি।

রাজী' এবং বি'রে মঊনার ঘটনার পর মহানবী (সা.) এক মাস পর্যন্ত নামাযে 'কুনুত' করেন (রুকুর পর দাঁড়িয়ে দোয়া করা)। এক বর্ণনানুযায়ী রাজী' এবং বি'রে মঊনার ঘটনার কষ্টদায়ক এ সংবাদ মহানবী (সা.) একই রাতে জানতে পেরেছিলেন। উপরিউক্ত দুটি ঘটনায় সাহাবীদেরকে প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। রাজী'তে তো কেবল দশজন সাহাবী ছিলেন, অপরদিকে বি'রে মঊনায় সত্তর জন সাহাবী ছিলেন, যাদের মাঝে কেবল দু'জন জীবিত ছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) বি'রে মঊনার ঘটনায় এত গভীর দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছেন যার অনুমান সেই বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় যেখানে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি কখনো মহানবী (সা.)-কে এতটা ব্যাকুল হতে দেখিনি যতটা তিনি (সা.) বি'রে মঊনার শহীদদের ঘটনায় হয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে 'কুনুত' করেছেন (রুকুর পর দাঁড়িয়ে দোয়া করা) যাতে রি'ল, যাকওয়ান এবং বনু লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীস, মহানবী (সা.) রি'ল এবং যাকওয়ান গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে প্রায় এক মাস পর্যন্ত বদদোয়া করেন। সহীহ্ মুসলিমে দোয়ার শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছে যে, 'হে আল্লাহ্! বনু লেহইয়ান, রি'ল এবং যাকওয়ান গোত্রের ওপর অভিশাপ প্রেরণ করো, আর বনু উসাইয়ার ওপরও (কেননা তারা) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বনু গিফারকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখুন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর রাজী' এবং বি'রে মঊনার ঘটনা অবগত হওয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

উক্ত ঘটনা অবগত হওয়ার দিন থেকে শুরু করে লাগাতার ৩০ দিন পর্যন্ত তিনি (সা.) প্রত্যহ ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে আহাজারি করে রি'ল এবং যাকওয়ান আর উসাইয়া ও বনু লেহইয়ান গোত্রের নাম নিয়ে নিয়ে খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন যে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হও আর ইসলামের শত্রুর হাতকে প্রতিহত করো, যারা তোমার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এত নির্দয় ও পাষণ্ডের ন্যায় নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে। এই ছিল বি'রে মঊনার অর্থাৎ উক্ত অভিযানের ঘটনা।

আমি যেভাবে তাহরীক করে আসছি, ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই অত্যাচারীদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। নিষ্পাপ লোকদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হচ্ছে যেভাবে ঐ সাহাবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল আর প্রবঞ্চনা করে কখনো এক জায়গায় পাঠানো হচ্ছে, কখনো অন্য জায়গায়। এরপর সেখানে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন।

পৃথিবীর বর্তমান সংকট নিরসনের জন্যও দোয়া করুন। জগৎ খুব দ্রুততার সাথে ধ্বংসের দিকে ধাবমান এবং যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে এবং এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। ইদানীং তাদের সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)